অক্টোবর - ডিসেম্বর ২০১৬

ISSN 2222-5188

৫ম পর্ব, ৪র্থ সংখ্যা

ইনফো মেডিকাস

চিকিৎসা সাময়িকী

- উচ্চ রক্তচাপ
- মৃগী রোগ
- ফাইলেরিয়াসিস
- মিজেলস

সূচী

বিশেষ প্রবন্ধ

উচ্চ রক্তচাপ ৩

চমকপ্রদ তথ্য

আঙুল চুষলে অ্যালার্জির ঝুঁকি কমে ৬

ডায়াবেটিস রোগীর আর নয় অঙ্গহানি ৬

জনস্বাস্থ্য

মৃগী রোগ ৭

সাধারণ জিজ্ঞাসা ৯

চিকিৎসা

ফাইলেরিয়াসিস ১০

মিজেলস ১২

স্বাস্থ্যকথা

রক্তনালী ব্লক হওয়া প্রতিরোধ করবে ৭ টি খাবার ১৪

ইনফো কুইজ ১৫

সম্পাদক মন্ডলী

এম. মহিবুজ জামান

ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান

ডাঃ তারেক মোহাম্মদ নূরুল ইসলাম

ডাঃ তারেক-আল-হোসাইন

ডাঃ আদনান রহমান

ডাঃ ফজলে রাব্বি চৌধুরী

ডাঃ মোঃ ইসলামুল হক

ডাঃ ফাহিমা জাহান ইশানা

সম্পাদকীয়

প্রিয় চিকিৎসক,

চিকিৎসা বিজ্ঞান একটি নিত্য উন্মোচনশীল জ্ঞান যা দ্বারা রোগীর রোগ নির্ণয় ও চিকিৎসা করা যায়। এই চিকিৎসা বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত আধুনিকায়ন হচ্ছে, তাই চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্পর্কিত আধুনিক তথ্য, প্রযুক্তি ও পদ্ধতি সম্পর্কে অব্যাহত জ্ঞান আহরণ আবশ্যক। আর সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এবারের ইনফো মেডিকাসটি আপনাদের জন্য সাজানো হয়েছে। আমরা আশা করি এই সংখ্যাটি পড়ে আপনারা স্বাস্থ্য বিষয়ে আধুনিক ধারণা পাবেন, যা দ্বারা আমাদের দেশের জনগণ আপনাদের দ্বারা আরও উপকৃত হবে।

বিশ্বে প্রতি বছর অনেক মানুষ উচ্চ রক্তচাপ ও এর জটিলতায় মৃত্যুবরণ করে থাকে। তাই কিভাবে এ রোগ থেকে পরিত্রান পাওয়া যায় এবং একে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা বিশেষ প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মৃগী রোগ একটি জন গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। এ রোগ যেমন একটি মানসিক সমস্যা, তেমনি একটি সামাজিক সমস্যাও বটে। তাই কিভাবে এ রোগকে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তা এই সংখ্যার জনস্বাস্থ্য বিভাগে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগ এমন একটি সামাজিক রোগ যা সাধারণত সচেতনতার অভাবে হয়ে থাকে। এ রোগের জীবাণুর আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য কিছু প্রতিরোধ ব্যবস্থা নিলেই এই রোগ থেকে চিরতরে মুক্তি পাওয়া যায়। এই রোগ সম্পর্কে চিকিৎসা বিভাগে বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

প্রতিবারের মতো এবারও স্বাস্থ্যকথা বিভাগে কিছু গুরুত্বপূর্ণ ও সহজলভ্য খাবার সম্পর্কে তথ্য দেওয়া হয়েছে যা আমাদের রক্তনালিকে ব্লক হওয়া থেকে প্রতিরোধ করবে।

পরিশেষে মানুষের স্বাস্থ্য সেবায় আপনার অবদানের জন্য আমরা আপনাকে কৃতজ্ঞতা ও আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শুভেচ্ছান্তে,

ডাঃ এস. এম. সাইদুর রহমান
ডেপুটি জেনারেল ম্যানেজার
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট

উচ্চ রক্তচাপ

উচ্চ রক্তচাপ একটি নীরব ঘাতক। পৃথিবীতে ২৫ বছরের উর্ধ্বে শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভুগেন। বিশ্বে প্রতিবছর ১৭.৩ মিলিয়ন মানুষ উচ্চ রক্তচাপ এবং এর আনুসাঙ্গিক জটিলতায় মৃত্যুবরণ করে। নিম্ন এবং মধ্য আয়ের দেশগুলোতে শতকরা ৮০ ভাগ লোকের মৃত্যুর কারণ হচ্ছে উচ্চ রক্তচাপ। উচ্চ রক্তচাপ রোগটি সকলের না থাকলেও সুস্থ্য এবং অসুস্থ প্রতিটি মানুষেরই রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার থাকে। আসলে ব্লাড প্রেসার হচ্ছে হৃদপিন্ড রক্তকে ধাক্কা দিয়ে ধমনীতে পাঠালে ধমনীর গায়ে যে চাপ বা প্রেসার সৃষ্টি হয় তাই হলো ব্লাড প্রেসার। এই চাপ এর একটি স্বাভাবিক মাত্রা আছে আর যখন তা স্বাভাবিক মাত্রা ছাড়িয়ে যায় তখনি তাকে বলা হয় উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশন (Hypertension)।

স্বাভাবিক রক্তচাপ

পূর্ণ বিশ্রামে থাকা একজন সুস্থ স্বাভাবিক মানুষের রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেসার হবে ১২০/৮০ মিলিমিটার অফ মারকারি। এক্ষেত্রে ১ম সংখ্যাটি (১২০) দ্বারা হৃদপিন্ডের সংকোচনের সময় ধমনীর ব্লাড প্রেসার এবং ২য় সংখ্যাটি (৮০) দ্বারা হৃদপিন্ডের প্রসারণের সময়ে ধমনীর ব্লাড প্রেসারকে নির্দেশ করা হয়। এই ১ম প্রেসার সংখ্যাটি যা সিস্টোলিক প্রেসার নামে পরিচিত, সব সময়ই ২য় টি থেকে বেশি এবং এর স্বাভাবিক মাত্রা ১৪০ মিলিমিটার অফ মারকারি এর নীচে এবং ৯০ মিলিমিটার অফ মারকারি এর উর্ধ্বে। অন্যদিকে ২য় প্রেসার সংখ্যাটিকে ডায়াস্টোলিক প্রেসার বলা হয় এবং এর স্বাভাবিক মাত্রা ৯০ মিলিমিটার অফ মারকারি এর নীচে এবং ৬০ মিলিমিটার অফ মারকারি এর উর্ধ্বে। তাই যখন উপরের প্রেসারটি ১৪০ মিলিমিটার অফ মারকারি বা তার উর্ধ্বে অথবা নীচের প্রেসারটি ৯০ মিলিমিটার অফ মারকারি বা তার উর্ধ্বে পাওয়া যায় তখন ধরে নিতে হবে রোগীর ব্লাড প্রেসার স্বাভাবিক এর উর্ধ্বে অর্থাৎ রোগী উচ্চ রক্তচাপ বা হাইপারটেনশনে ভুগছেন। তবে বয়সের উপর ভিত্তি করে এই মাত্রার কিছুটা তারতম্য হতে পারে।

উচ্চ রক্তচাপের প্রকারভেদ		
উচ্চ রক্তচাপ	**সিস্টোলিক (মিলিমিটার অফ মারকারি)**	**ডায়াস্টোলিক (মিলিমিটার অফ মারকারি)**
গ্রেড - ১ (মৃদু উচ্চ রক্তচাপ)	১৪০ - ১৫৯	৯০ - ৯৯
গ্রেড - ২ (মাঝারি উচ্চ রক্তচাপ)	১৬০ - ১৭৯	১০০ - ১০৯
গ্রেড - ৩ (অত্যন্ত বেশি উচ্চ রক্তচাপ)	১৮০ বা বেশি	১১০ বা বেশি

কারণ

সাধারণত দুই ধরণের উচ্চ রক্তচাপে মানুষ ভুগেন। এগুলো হচ্ছে প্রাইমারি উচ্চ রক্তচাপ ও সেকেন্ডারি উচ্চ রক্তচাপ।

প্রাইমারি উচ্চ রক্তচাপ

সাধারণত উচ্চ রক্তচাপের ৯০ ভাগ কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাই যে রক্তচাপের কোনো কারণ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না তা হচ্ছে প্রাইমারি উচ্চ রক্তচাপ। এ ধরণের উচ্চ রক্তচাপ হৃদপিন্ডের জন্য খুব বিপদজনক এবং নীরব ঘাতক হিসেবে কাজ করে। কারণ এ ধরণের রক্তচাপ প্রতিরোধ না হলে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জটিল হৃদরোগ হওয়ার সম্ভাবনা অনেকগুণ বেড়ে যায়।

সেকেন্ডারি উচ্চ রক্তচাপ

যখন উচ্চ রক্তচাপের কারণগুলি জানা যায় তখন সেই উচ্চ রক্তচাপকে সেকেন্ডারি উচ্চ রক্তচাপ বলে। সাধারণত দেখা যায় প্রাপ্ত বয়স্কদের মধ্যে ১০ ভাগ লোক সেকেন্ডারি উচ্চ রক্তচাপে ভুগেন। যেসব কারণে সেকেন্ডারি উচ্চ রক্তচাপ হয় সেগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো -

- মদ্যপান করলে
- অতিরিক্ত শারীরিক স্থূলতা
- একলামসিয়া, প্রিএকলামসিয়া রোগে আক্রান্ত হলে
- কিডনি রোগে আক্রান্ত হলে
- অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির রোগ থাকলে
- কিছু ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার ফলে যেমন ব্যাথানাশক ওষুধ, জন্মনিয়ন্ত্রণ ওষুধ, স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ ইত্যাদি
- চর্বি বা রক্ত জমাট বেঁধে রক্তনালী সরু হয়ে গেলে
- ধূমপান করলে
- পরিবারে কারো উচ্চ রক্তচাপ থাকলে
- বয়স ৬৫ বছরের বেশি হলে

লক্ষণ

অনেকের শুরুতে উচ্চ রক্তচাপে কোনো উপসর্গ থাকে না। রুটিন চেকআপে বা অন্য কোনো কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হলে উচ্চ রক্তচাপ ধরা পড়ে।

তবে কারো কারো ক্ষেত্রে কিছু কিছু উপসর্গ দেখা দিতে পারে। যেমন -

- মাথা ব্যথা
- ঘাড়ে ব্যথা
- মাথা গরম অনুভূত হওয়া
- ঘুমের ব্যাঘাত ঘটা
- বুকে চাপ অনুভব করা
- বুক ধড়ফড় করা
- চোখের দৃষ্টিতে অসুবিধা বা ঝাপসা লাগা
- সব সময় মেজাজ খিটখিটে থাকা

রোগ নির্ণয়

উচ্চ রক্তচাপ সাধারণত সুপ্ত অবস্থায় থাকে। এই জন্য নিয়মিত রক্তচাপ পরীক্ষা করানো ভালো। সাধারণত অন্য কোন রোগের কারণ খোঁজার জন্য রক্তচাপ মাপার সময় উচ্চ রক্তচাপ ধরা পরতে পারে। নিয়মিত রোগীর ইতিহাস নেয়া এবং কিছু পরীক্ষার মাধ্যমে উচ্চ রক্তচাপ রোগটি নির্ণয় করা হয়।

রোগীর ইতিহাস নেওয়া

- রোগীর পরিবারে কারো উচ্চ রক্তচাপ আছে কিনা
- রোগীর অতিরিক্ত লবণ খাওয়ার অভ্যাস আছে কিনা
- রোগী ধূমপান করে কিনা
- রোগী মদ্যপান করে কিনা
- রোগী নিয়মিত ব্যায়াম করে কিনা
- রোগী দুশ্চিন্তাগ্রস্থ কিনা
- রোগীর অন্য কোন রোগ আছে কিনা (যেমন - কিডনি রোগ)

পরীক্ষা

প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণত রোগীর রেডিও-ফিমোরাল ব্লাড প্রেসার পরিমাপ করা হয়। এছাড়া নিচের পরীক্ষাগুলো করা হয় -

- ১২-লীড ই সি জি
- ব্লাড সুগার
- প্লাজমা লিপিড প্রোফাইল
- সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট
- ইকোকারডিওগ্রাম
- সেরাম ক্রিয়েটিনিন
- ব্লাড ইউরিয়া
- ইউরিন এনালাইসিস
- থাইরয়েড ফাংশন টেস্ট
- ফানডোস্কপি

চিকিৎসা

উচ্চ রক্তচাপ প্রতিরোধযোগ্য রোগ। একটু সচেতন থাকলে এটি সহজে প্রতিরোধ করা সম্ভব। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার নিয়ন্ত্রণ একান্ত জরুরী। আমাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রায় একটু পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে উচ্চ রক্তচাপ মুক্ত সুস্থ জীবন। চিকিৎসার মূল উদ্দেশ্য হল রোগীর রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং রোগীর উচ্চ রক্তচাপ জনিত অন্য কোনও হৃদরোগ না হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা, যেমন করোনারি হার্ট ডিজিস্, স্ট্রোক, হার্ট ফেইলর। এই জন্য প্রতি ৩ মাস পর পর রোগীর রক্তচাপ পরীক্ষা করা এবং প্রতি বারেই রোগীকে জীবনযাত্রা পরিবর্তনের পদ্ধতি সম্বন্ধে উপদেশ দেওয়া এবং নিয়মিত ওষুধ খেতে বলা।

জীবনযাত্রা পরিবর্তন পদ্ধতি

- ওজন নিয়ন্ত্রণঃ প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষের ক্ষেত্রে ওজন বৃদ্ধির আনুপাতিক হারে রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়। তাই নিজ উচ্চতা এবং দেহ গঠনের উপর ভিত্তি করে রোগীকে ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে বলতে হবে
- নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রমঃ সপ্তাহে ন্যুনতম ৫ দিন ৩০-৬০ মিনিটের ব্যায়াম রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। তাই রোগীকে নিয়মিত ব্যায়াম বা শারীরিক পরিশ্রমের পরামর্শ দিতে হবে
- পুষ্টিকর খাবার গ্রহণঃ দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় শস্যজাতীয় খাবার, প্রচুর ফলমূল এবং শাকসবজি এর পরিমাণ বৃদ্ধি করে কোলেস্টেরল সমৃদ্ধ খাবার কমাতে বলতে হবে
- অতিরিক্ত লবণ পরিহারঃখাবার গ্রহণের সময় অতিরিক্ত লবণ রক্তচাপ বাড়ায়, তাই খাদ্যে অতিরিক্ত লবণ পরিহার করতে বলতে হবে
- ধূমপান পরিহারের পরামর্শ দিতে হবে
- অতিরিক্ত চা বা কফি পান পরিহার করতে বলতে হবে
- দুশ্চিন্তা না করার পরামর্শ দিতে হবে
- নিয়মিত রক্তচাপ মাপতে বলতে হবে

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ

উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের জন্য রোগীকে সাধারণত নীচের যেকোনো একটি গ্রুপ এর ওষুধ দিয়ে চিকিৎসা করা হয় -

- ডাইইউরেটিকস (থায়াজাইড, ফ্রুসেমাইড)
- এসিই ইনহিবিটর (কেপটোপ্রিল, রেমিপ্রিল)
- এনজিওটেনসিন-II রিসিপটোর ব্লকার (লোসারটান, ভালসারটান)
- ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার (এমলোডিপিন, ভেরাপামিল)
- বিটা ব্লকার (এটিনোলোল, প্রপানোলোল)

যেসব রোগী বহু বছর ধরে উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন বা যাদের উপরোক্ত ওষুধ সেবনের পরও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রনে থাকছে না, তাদের ক্ষেত্রে একাধিক ওষুধের সমন্বয় প্রয়োজন হয়ে থাকে। সেক্ষেত্রে রোগীকে ক্রমান্বয়ে ছক-১ অনুযায়ী চিকিৎসা করা যেতে পারে।

ছক-১ঃ একাধিক ওষুধের সমন্বয়

	বয়স ৫৫ বছরের কম	বয়স ৫৫ বছরের বেশী
ধাপ-১	এ	সি
ধাপ-২	এ+সি	এ+সি
ধাপ-৩	এ+সি+ডি	এ+সি+ডি
ধাপ-৪	রেজিসটেন্স হাইপারটেনশন	
	এ+সি+ডি+আলফা অথবা বিটা ব্লকার	এ+সি+ডি+আলফা অথবা বিটা ব্লকার

এ - এ সি ই ইনহিবিটর অথবা এনজিওটেনসিন-II রিসিপটোর ব্লকার
সি - ক্যালসিয়াম চ্যানেল ব্লকার
ডি - ডাইইউরেটিকস

জটিলতা

উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত রোগীদের নিচের জটিলতাগুলো দেখা দিতে পারে -

- স্ট্রোক (Stroke)
- সাব এরাকনয়েড হেমরেজ (Subarachonoid Hemorrhage)
- হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি (Hypertensive Retinopathy)
- হাইপারটেনসিভ নেফ্রোপ্যাথি (Hypertensive Nephropathy)
- হার্ট ফেইলর (Heart Failure)

তথ্যসূত্রঃ ১. *Davidson's Principles & Practice of Medicine, 22nd Edition*
২. *ইন্টারনেট*

আঙুল চুষলে অ্যালার্জির ঝুঁকি কমে

অনেক শিশুর আঙুল চুষার অভ্যাস থাকে, আর এই অভ্যাস নিয়ে অধিকাংশ অভিভাবক দুশ্চিন্তায় থাকেন। তবে গবেষকরা বলেন, এমন অভ্যাস শিশুদের থাকলে এ নিয়ে চিন্তার কিছু নেই। নিউজিল্যান্ডের ইউনিভার্সিটি অব ওটাজায়ের একদল গবেষক গবেষণাটি করেন-"এই অভ্যাস নাকি অ্যালার্জি হওয়া থেকে শিশুদের প্রতিরোধ করে"। গবেষণাটি করা হয় পাঁচ থেকে সাত বছরের এক হাজার শিশুর ওপর। গবেষণার ফলাফলে দেখা গেছে, যে শিশুরা বুড়ো আঙুল চোষে বা নখ কামড়ায়, তাদের পশুপাখি, ধুলাবালি, ফুলের রেণু ইত্যাদি থেকে যে অ্যালার্জি হয় তা প্রতিরোধ করে। গবেষণায় বলা হয়, নখ কামড়ানোর কারণে শিশুটি যে জীবাণুর সংস্পর্শে আসে, এটি সাধারণত খুব ক্ষতিকর নয়; বরং এটি অ্যালার্জি হওয়ার ঝুঁকি কমায় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। তবে অবশ্যই খুব ময়লার মধ্যে খেলাধুলা করলে বা হাতে ময়লা

লেগে থাকলে শিশু যদি নখ কামড়ায়, সেটি কিন্তু ক্ষতির কারণ হতে পারে। তাই বিষয়টি নিয়ে সতর্ক থাকা উচিত।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ডায়াবেটিস রোগীর আর নয় অঙ্গহানি

ডায়াবেটিস রোগের একটি জটিলতা হচ্ছে পেরিফেরাল ভাসকুলার ডিজিজ যা মানুষের অঙ্গহানির অন্যতম প্রধান কারণ। ২৫ শতাংশ ডায়াবেটিস রোগীকে এ রোগের কারণে অঙ্গহানির শিকার হতে হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অস্টিনে অবস্থিত ইউনিভার্সিটি অব টেক্সাসের বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক অ্যারন বেকার সঞ্জীবনী এর নেতৃত্বে এক দল গবেষক এমন এক থেরাপি উদ্ভাবন করছেন, যার ফলে প্রোটিনভিত্তিক "গ্রোথ ফ্যাক্টর" কাজে লাগিয়ে নতুন রক্তনালী তৈরি করা হবে। মানবদেহের নিজস্ব পুনরুৎপাদন পদ্ধতি ব্যবহার করে আক্রান্ত রক্তনালীকে নতুন সৃষ্ট রক্তনালী দিয়ে প্রতিস্থাপন করাই এই উদ্ভাবনের মূল তত্ত্ব বলে জানিয়েছেন অ্যারন। কিন্তু এই উদ্ভাবন মানুষের শরীরে এখনো আশানুরূপ কাজ করেনি। এর পেছনের কারণ হিসেবে অ্যারন দায়ী করেছেন ডায়াবেটিসে আক্রান্ত শরীরের এমন আরেকটি প্রোটিনের হারিয়ে যাওয়াকে, যেটি ছাড়া এই গ্রোথ ফ্যাক্টর কাজ করে না। এই প্রোটিনটির নাম "সিন্ডেকান-৪" যা রক্তনালীর কোষের গায়ে থাকে এবং কোষের সংকেত আদান প্রদানের কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে বলে মনে

করা হয়। সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা গেছে, এই প্রোটিনটির সঙ্গে মিলিতভাবে গ্রোথ ফ্যাক্টরটি বেশি ভালো কাজ করে। অ্যারন এবং তাঁর দল নতুন এই পুনরুৎপাদনমূলক থেরাপি নিয়ে খুব আশাবাদী।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

মৃগী রোগ

মস্তিস্ক মানুষের শরীরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করে। মস্তিস্কের কোষগুলি যদি হঠাৎ অতিমাত্রায় উত্তেজিত হয়ে পড়ে তখন মৃগী রোগ দেখা দেয়। মৃগী রোগ যে কোনো বয়সে হতে পারে, মৃগী রোগ একটি গুরুতর স্নায়ু রোগ। সঠিক সময়ে রোগ নির্ণয় ও যথাযথ চিকিৎসার মাধ্যমে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। অন্যথায় এটি মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে। মৃগী রোগ আমাদের দেশে একটি অতি পরিচিত রোগ। এটা কোনো সংক্রামক রোগ নয়। বিশ্বে মৃগী রোগীর সংখ্যা প্রায় ৪০ থেকে ৫০ মিলিয়ন, যার অধিকাংশই উন্নয়নশীল দেশের অধিবাসী। বাংলাদেশের প্রতি ২০০ জনের মধ্যে ১ জন এই রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকে। এই রোগীদের শতকরা ৫০ থেকে ৬০ ভাগের বয়স ১৫ বছরের নিচে।

কারণ

বেশিরভাগ রোগীর ক্ষেত্রেই মৃগী রোগের নির্দিষ্ট কারণ চিহ্নিত করা যায় না। তবে যেসব কারণে এ রোগ হতে পারে সেগুলো হলো-

- জিনগত কারণ
- মাথায় কোনো কারণে আঘাত পেলে
- ব্রেন টিউমার বা স্ট্রোকের কারণে মস্তিষ্কের কোনো ক্ষতি হলে
- মেনিনজাইটিস হলে
- গর্ভাবস্থায় শিশুদের মস্তিস্ক কোন কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হলে যেমন মাতৃগর্ভে অক্সিজেনের অভাব, মায়ের পুষ্টির অভাব বা ইনফেকশনের জন্য
- অটিজম থাকলে
- শরীরের তাপমাত্রা অত্যধিক বেড়ে গেলে
- শরীরে তীব্র পানি স্বল্পতা দেখা দিলে
- বিভিন্ন ওষুধের কারণে

মৃগী রোগের শ্রেণী বিভাগ

মৃগী রোগকে সাধারণত ৪ ভাগে ভাগ করা যায় -

- সাধারণ
- বড় ধরণের মৃগী রোগ
- মৃদু ধরণের মৃগী রোগ
- শরীরের কোনো নির্দিষ্ট অংশে খিঁচুনি

লক্ষণ

মৃগী রোগের প্রকারভেদের উপর ভিত্তি করে নিচের লক্ষণগুলো দেখা যায় -

সাধারণ

এই ধরণের মৃগী রোগে সাধারণত তেমন কোন লক্ষণ প্রকাশ পায় না। তবে মাঝে মধ্যে রোগীর খিঁচুনি হতে পারে যা এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার পূর্ব লক্ষণ।

বড় ধরণের মৃগী রোগ

- এই রোগ সাধারণত কয়েক ঘন্টা থেকে কয়েক দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। এই সময় রোগীর আচরণে পরিবর্তন আসে
- জ্ঞান হারানো বা খিঁচুনি হবার পূর্বে রোগী বুঝতে পারে
- রোগী জ্ঞান হারায় ও মাটিতে পড়ে যায়, সবগুলো মাংশ পেশী টান টান হয়ে যায় এবং রোগী নীল বর্ণ হয়ে যায়। সাধারণত ২০ থেকে ৩০ সেকেন্ড পর্যন্ত রোগীর এই অবস্থা স্থায়ী হয়
- মুখ দিয়ে ফেনা বের হয় এবং রোগী জিহ্বা কামড় দিয়ে রাখতে পারে
- রোগীর অজান্তেই প্রস্রাব, পায়খানা বেরিয়ে আসতে পারে

মৃদু ধরণের মৃগী রোগ

- হঠাৎ করে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে যা ১০ থেকে ১৫ সেকেন্ড স্থায়ী থাকে
- কখনও অজ্ঞান হওয়ার সাথে সাথে খিঁচুনি শুরু হয়
- রোগী অজ্ঞান হওয়ার পর মুহূর্তে জ্ঞান ফিরে দাঁড়িয়ে যায়

শরীরের কোনো নির্দিষ্ট অংশে খিঁচুনি

এটা বিভিন্ন রকমের হতে পারে। এখানে জ্ঞান হারানোর সাথে কোনো সম্পর্ক নেই। শরীরের নির্দিষ্ট জায়গায় খিঁচুনি হতে পারে। বিভিন্ন রকমের মানসিক বিভ্রম হতে পারে। খিঁচুনি এক অঙ্গ থেকে বাড়তে বাড়তে পুরো শরীরে হতে পারে। খিচুনি বন্ধ হওয়ার পর ঐ অঙ্গে প্যারালাইসিস হতে পারে।

পরীক্ষা

মৃগী রোগে আক্রান্ত রোগীদের নিচের পরীক্ষাগুলো করা হয় -

- সি বি সি
- ই এস আর
- সেরাম ইলেক্ট্রোলাইট
- সেরাম ক্যালসিয়াম
- ব্লাড গ্লুকোজ
- ব্লাড ইউরিয়া
- লিভার ফাংশন টেস্ট
- এক্স-রে
- ই সি জি
- ই ই জি
- সি টি স্ক্যান
- এম আর আই

চিকিৎসা

পর্যবেক্ষণ

সকল খিঁচুনির জন্য অনেক সময় প্রথমেই সরাসরি মৃগী রোগের চিকিৎসা করা হয় না, বিশেষ করে যদি একবার খিঁচুনি হয়। যদি ইহা মারাত্মক অবস্থায় পৌছায় তখন প্রাথমিক চিকিৎসার প্রয়োজন হয়।

খিঁচুনির সময় প্রাথমিক চিকিৎসা

- মৃগী রোগে আক্রান্ত রোগী অসুখ হওয়ার সাথে সাথে নিজে কি করে তা বলতে পারেনা। এ সময় তার পাশে যে থাকবেন তিনিই সবচেয়ে বড় সাহায্যকারী এবং উপকারী। জ্ঞান ফেরার পর রোগীর কিছু সময়ের জন্য মানসিক বিভ্রম দেখা দেয় বিধায় এ সময়টুকু রোগীর পাশে থাকা এবং আশ্বস্ত করা উচিত
- রোগী দাঁড়ানো বা চেয়ারে বসা অবস্থায় খিঁচুনিতে আক্রান্ত হলে তাকে আলতো করে ধরে মেঝেতে শুইয়ে দিতে হবে অথবা এমন ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে রোগী পড়ে গিয়ে মাথায় আঘাত না পায়। রোগীর মাথার নিচে বালিশ বা নরম কোন কাপড় বা ফোম জাতীয় কিছু দিতে হবে। খিঁচুনি স্বাভাবিকভাবে শেষ হতে দিতে হবে
- খিঁচুনি বন্ধ করার জন্য রোগীকে চেপে ধরা যাবে না। রোগীর মুখে জোর করে আঙুল বা অন্য কিছু ঢোকানোর চেষ্টা করা যাবে না। রোগীর জিহ্বায় দাঁত দিয়ে কামড় লাগলেও খিঁচুনিরত অবস্থায় তা ছাড়ানোর জন্য জোরাজুরি করা উচিত নয়
- খিঁচুনি শেষ হলে রোগীকে এক পাশে কাত করে শুইয়ে দিতে হবে
- খিঁচুনি যদি ৫ মিনিটের বেশী স্থায়ী হয়, কিংবা রোগীর একবার খিঁচুনির পর জ্ঞান ফেরার আগেই দ্বিতীয় খিঁচুনি চলে আসে তা হলে রোগীকে দ্রুত হাসপাতালে পাঠাতে হবে
- খিঁচুনি শেষ হলে রোগীর নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করতে হবে, রোগী ঠিকমতো শ্বাস নিতে পারছে কি না সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যাহত হয় এমন কোন কিছু মুখে বা নাকে থাকলে তা সরিয়ে দিতে হবে

মৃগী রোগ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ

মৃগী রোগে আক্রান্ত রোগীকে নীচের ওষুধগুলো দেয়া হয় -

- ডায়াজিপাম
- ফেনাইটোইন
- কার্বামাজেপিন
- লেভেটাইরাসিটাম
- ভ্যালপ্রোয়িক অ্যাসিড

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

০১

প্রশ্নঃ অল্প বয়স্কদেরও কি বাতের ব্যথা হতে পারে?

উত্তরঃ বাত বা আর্থ্রাইটিস নানা বয়সে হতে পারে। বিভিন্ন বয়সে এ সমস্যা দেখা দিতে পারে। কেবল বয়স্ক বা প্রবীণ ব্যক্তিদের যে বাত হয়, এমন ধারণা ঠিক নয়। বরং কিছু কিছু বাতজাতীয় রোগ যেমন - জুভেনাইল আর্থ্রাইটিস, এসএলই ইত্যাদি কম বয়সীদেরই হয়।

০২

প্রশ্নঃ প্রস্রাবে জ্বালা করা কি সব সময় সংক্রমণের লক্ষণ?

উত্তরঃ প্রস্রাবের সংক্রমণে প্রস্রাবের সময় জ্বালা বা ব্যথা করে তা ঠিক। তবে সব সময় এর কারণ এটা নাও হতে পারে। যেমন গরমের দিনে পানিশূন্যতার জন্য প্রস্রাবের ঘনত্ব বেড়ে গেলেও জ্বালা করতে পারে। অনেক সময় কোনো অ্যালার্জি বা প্রতিক্রিয়ার কারণেও এমন হতে পারে। তাই শুধু প্রস্রাবে জ্বালা করলেই না বুঝে অ্যান্টিবায়োটিক খাওয়া ঠিক নয়।

০৩

প্রশ্নঃ অল্প বয়সেই চুল পেকে যাওয়া কি কোনো রোগ? এর সমাধান কী?

উত্তরঃ কম বয়সে চুল পেকে যাওয়া কোনো রোগের লক্ষণ নয়। চুল পাকার সঙ্গে বয়সের তেমন সম্পর্ক নেই। চুলে পাক ধরতে শুরু করলে প্রতিদিন প্রচুর পরিমাণ শাকসবজি ও ফলমূল খেতে হবে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ এসব খাবার চুল পাকার প্রবণতা কমাতে সাহায্য করবে। তবে যে চুলগুলো সাদা হয়ে গেছে , সেগুলোর কালো রং ফিরিয়ে আনার উপায় নেই।

০৪

প্রশ্নঃ শিশুদের কি চোখে ছানি পড়তে পারে?

উত্তরঃ শৈশবেও ছানি পড়তে পারে। সাধারণত বংশগত রোগে বা গর্ভকালে মায়ের হাম বা সংক্রমণ, জ্বর হলে বা গর্ভকালীন প্রথম তিন মাসে মা কোনো বিকিরণের আওতায় এলে যেমন - এক্স-রে করা হলে বা অনেক সময় মায়ের অপুষ্টিজনিত কারণেও শিশু ছানি নিয়ে জন্মাতে পারে। জন্মের পরও ছানি পড়ার বিভিন্ন কারণের মধ্যে রয়েছে আঘাত, শিশুর ডায়াবেটিস, কিছু চর্মরোগ, তেজস্ক্রিয়তা, দীর্ঘদিন ধরে স্টেরয়েড ওষুধ সেবন, চোখের বিভিন্ন রোগ ইত্যাদি।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ফাইলেরিয়াসিস

ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগ একটি সংক্রামক ব্যাধি। ফাইলেরিয়াল পরজীবী মানুষের শরীরে প্রবেশ করলে এ রোগের সৃষ্টি হয়। কয়েক প্রজাতীর স্ত্রী মশা এ রোগ ছড়ানোর জন্য দায়ী, তবে বাংলাদেশে কিউলেক্স জাতীয় স্ত্রী মশা ফাইলেরিয়াসিস রোগীকে কামড় দিয়ে পরজীবী বহন করে। পরে সুস্থ মানুষকে কামড় দিয়ে এই রোগ সংক্রমণ করে। ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে রোগীর হাঁটুর নিচের অংশ, হাতে, স্তনে, যৌনাঙ্গে প্রদাহ হয়ে আক্রান্ত অঙ্গটি মোটা হয়ে যায়। এ রকম পর্যায়কে ফাইলেরিয়াসিস বা গোদ রোগ বলা হয়।

ফাইলেরিয়াসিস বাংলাদেশের অন্যতম একটি স্বাস্থ্য সমস্যা যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বোঝা স্বরূপ। দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকা ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় ৮৩টির বেশি দেশে এ রোগ বিদ্যমান। অপুষ্টি, দারিদ্রতা, সামাজিক কুসংস্কার ও বসত বাড়ির নোংরা পরিবেশ, ঘনবসতি ও স্বাস্থ্য সচেতনতার অভাব ইত্যাদি এই রোগ সংক্রমণের জন্য দায়ী।

কোন কোন এলাকায় বিদ্যমান

বাংলাদেশে বিশেষ করে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁও, দিনাজপুর, চাপাইনবাবগঞ্জ, নীলফামারি, রংপুর, রাজশাহী ও লালমনিরহাট এলাকায় এ রোগের প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি।

যেসব পরজীবী দ্বারা ফাইলেরিয়া রোগ হয়

- উচেরেরিয়া বেনক্রফটি *(Wuchereria bancrofti)*
- ব্রুজিয়া ম্যালাই *(Brugia malayi)*
- ব্রুজিয়া টিমোরী *(Brugia timori)*
- লোয়া লোয়া *(Loa loa)*

উপরোক্ত পরজীবীগুলোর মধ্যে বাংলাদেশে উচেরেরিয়া বেনক্রফটি *(Wuchereria bancrofti)* দ্বারা মানুষ বেশি আক্রান্ত হয়। এই প্রজাতীর পূর্ণ বয়স্ক পরজীবী মানুষের লসিকাগ্রন্থি ও নালীতে থাকে। এটি দেখতে লম্বা চুলের ন্যায়। স্বচ্ছ ও ঘিয়ে রং-এর হয়। একটি পূর্ণ বয়স্ক ফাইলেরিয়া জীবাণু মানুষের শরীরে ৮ থেকে ১০ বছর বেঁচে থাকে।

এগুলো সাধারণত রাত ৮টা থেকে ভোর ৪টা পর্যন্ত মানুষের শরীরের ত্বক সংলগ্ন শিরা ও উপশিরায় অবস্থান করে। তাই ফাইলেরিয়া জীবাণু পরীক্ষার জন্য রাতে রক্ত নেয়া হয়।

লক্ষণ

এ রোগের লক্ষণগুলো চার ভাগে দেখা দেয় -

লক্ষণহীনঃ জীবাণু দেহে প্রবেশের পর অনেক ক্ষেত্রে কয়েক বছর কোন লক্ষণ দেখা দেয় না। তবে জীবাণুটি বিশেষত কিডনি, ফুসফুসের লসিকাগ্রন্থি ও নালীতে ক্রমাগত ক্ষতি করে। এই জন্য মাঝে মধ্যে ফাইলেরিয়া অধ্যুষিত এলাকার লোকজনের রক্ত পরীক্ষা করতে হয়।

তাৎক্ষণিক লক্ষণঃ এক্ষেত্রে কারো কারো হঠাৎ লক্ষণ দেখা যায়। যেমন চুলকানী, চর্মরোগ, ত্বক লাল ও চাকা চাকা হওয়া, লসিকা গ্রন্থি ফুলে যাওয়া, জ্বর, কাশি ও কষ্ট হওয়া। চিকিৎসা না নিলে ৬ মাসের মধ্যে আক্রান্ত অঙ্গ ফুলে যায়।

দীর্ঘসূত্রী লক্ষণঃ দীর্ঘসূত্রী আক্রান্ত রোগীরা বেশি ভুক্তভোগী। এই সব রোগীর বেলায় রক্ত পরীক্ষায় প্রায়ই ফাইলেরিয়া জীবাণু পাওয়া যায় না। মশার কামড়ের ফলে আক্রান্ত অঙ্গ ফুলে যেতে কয়েক বছর সময় লাগে। পরজীবীগুলো মানুষের লসিকা গ্রন্থিতে প্রদাহের সৃষ্টি করে। ফলে ক্রমান্বয়ে এর তরল পদার্থ সঞ্চালন বন্ধ হয়ে যায় এবং ধীরে ধীরে আক্রান্ত অঙ্গ ফুলে মোটা হয়ে যায়। সাধারণত পা, অন্ডকোষ, স্তন, হাত ফুলে বিকৃত হয়ে যায়।

দীর্ঘসূত্রীতার মধ্যে তাৎক্ষণিকঃ রোগীর অনেক ক্ষেত্রে পা হাতের আঙ্গুলের মাঝখানে দিয়ে প্রদাহ হয়। অনেকের চুলকানোর কারণে প্রদাহ হয়। রোগীর প্রচণ্ড জ্বর ও মাথা ব্যথা দেখা দেয়।

পরীক্ষা

বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে এ রোগ নির্ণয় করা যায় নিচে তা দেয়া হলো -

প্রত্যক্ষভাবে

- পেরিফেরাল ব্লাড ফিল্ম - ফাইলেরিয়ার জীবাণুর উপস্থিতি পাওয়া যায়
- হাইড্রোসিল ফ্লুইড (অন্ডকোষের তরল) - ফাইলেরিয়ার জীবাণুর উপস্থিতি পাওয়া যায়

পরোক্ষভাবে

- রক্ত পরীক্ষা - রক্তে Eosinophil এর মাত্রা স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি পাওয়া যায়
- লসিকা গ্রন্থির বায়োপসি
- ইমিউনো ফ্লুরোসেন্স টেস্ট
- এলাইজা টেষ্ট
- আক্রান্ত অঙ্গের এক্সরে - কেলসিফাইড ফাইলেরির ক্ষেত্রে

চিকিৎসা

- শরীরে সন্দেহজনক লক্ষণ দেখা দিলে লক্ষণ অনুযায়ী চিকিৎসা দিতে হবে। যেমন -
  - নির্দিষ্ট সময়ে জ্বর আসলে প্যারাসিটামল জাতীয় ওষুধ সেবন করতে বলতে হবে
  - শরীর চুলকালে অ্যান্টিহিস্টামিন ও স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করতে বলতে হবে
  - সাধারণত ফুলা স্থানগুলোতে যেমন অন্ডকোষ, স্তন, হাত, পা ইত্যাদি জায়গায় কোন ধরণের ইনফেকশন দেখা দিলে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করতে বলতে হবে
- আক্রান্ত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদেরকেও প্রতিষেধক গ্রহণ করতে হবে, অন্যথায় তাদেরও আক্রান্ত হবার ঝুঁকি থেকে যাবে। এছাড়া আক্রান্ত রোগীদের আরও কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে -
  - প্রত্যেক দিন রাতে সাবান দ্বারা আক্রান্ত অঙ্গ পরিষ্কার করতে বলতে হবে
  - দিনে তিন বার হালকা ব্যায়ামের পরামর্শ দিতে হবে
  - রাতে ঘুমাবার সময় পায়ের নিচে বালিশ দিয়ে ঘুমাতে বলতে হবে এবং দিনের বেলায় পা যথাসম্ভব উচু করে রাখার পরামর্শ দিতে হবে
  - ফোলা পায়ে শক্ত করে ব্যান্ডেজ বাঁধার পরামর্শ দিতে হবে, তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে রক্ত চলাচলে কোন বিঘ্ন না ঘটে
  - আক্রান্ত অঙ্গ সবসময় শুকনা রাখতে বলতে হবে
- ওষুধঃ ডাই-ইথাইল কারবামাজিন নির্দেশমতো প্রতিদিন সেবন করতে বলতে হবে

প্রতিরোধ

যেহেতু ফাইলেরিয়াসিস মশার কামড় দ্বারা সংক্রমিত ও বিস্তৃত হয় তাই মশা দমন একটি কার্যকর প্রতিরোধের উপায়। আমাদের দেশে এ রোগ ছড়ানোর বেশি ভূমিকা পালন করে কিউলেক্স মশা। এ জাতীয় মশা শহর ও গ্রাম সবখানেই পাওয়া যায়। এরা সাধারণত ঘরের আশেপাশে নোংরা জলাশয়ে ডিম পাড়ে। নর্দমা, গর্ত, ডোবানালা, খাল, নিচু জমি মশার প্রজনন স্থান। তাই সব সময় এগুলো পরিষ্কার রাখতে হবে যাতে বংশ বিস্তার করতে না পারে। তাছাড়া এগুলো দিনে রাতে সব ঋতুতে ঘরে থাকতে দেখা যায়। ঘরের সব কিছু পরিষ্কার রাখতে হবে এবং মশারি টানিয়ে ঘুমানোর অভ্যাস করতে হবে। এছাড়া ম্যাসড্রাগ ট্রিটমেন্ট বা ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে ওষুধ প্রয়োগ করেও রোগটির বিস্তার কমানো যায়। এজন্য ডাইইথাইল কার্বামাজিন এবং এলবেন্ডাজোল একত্রে প্রয়োগ করা হয়। এছাড়া এলবেন্ডাজোল ও ইভারমেকটিন একত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে। এসব চিকিৎসা শুধু মাইক্রোফাইলেরিয়ার উপর কার্যকর। পূর্নবয়স্ক ফাইলেরিয়ার উপর এগুলো কাজ করে না। ফাইলেরিয়াসিস একবার হয়ে গেলে এর কোনো চিকিৎসা নেই। অনেক সময় অঙ্গ কেটে ফেলার প্রয়োজন হয়। তবে অন্ডকোষ আক্রান্ত হলে শল্যচিকিৎসায় ভাল ফল পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

মিজেলস

মিজেলস বা হাম একটি ভাইরাসজনিত রোগ। ক্ষুদ্র সংক্রমিত কণাসমূহ শ্বাসগ্রহণের মাধ্যমে এই রোগের বিস্তৃতি ঘটায়। প্রতিবছর এই রোগে সারা বিশ্বে প্রায় ১০ লক্ষ শিশুর মৃত্যু হয়। এটি মূলত বিশ্বব্যাপী শিশু রোগ। তা ছাড়া কিশোর ও বয়স্করাও এতে আক্রান্ত হয়, যার জন্য এর বিস্তার রোধ একান্ত জরুরী। এর কারণে সারা শরীরে ফুঁসকুড়ি দেখা দেয়। সাধারণত গরমের শুরুতে এ রোগ দেখা দেয়। যদিও এই ভাইরাসের চিকিৎসায় কার্যকরী কোনো ওষুধ নেই তথাপি টিকা দানের মাধ্যমে এই রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব।

কারণ

মিজেলস বা হাম রোগের প্রধান কারণ হল ভাইরাস। আরএনএ প্যারামিক্সো (RNA Paramixo Virus) ভাইরাস দ্বারা এই রোগ হয়।

সংক্রমণ

সাধারণত আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচিকাশি থেকে এটি বাতাসের মাধ্যমে ছড়ায়। কেউ হামে আক্রান্ত হলে তার আশেপাশের লোকজন বা পরিবারের সবাই হামে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এমনকি যদি কেউ রোগীর হাঁচি-কাশির সংস্পর্শে নাও আসে, তারাও এ রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। সাধারণত ফুঁসকুড়ি দেখা যাওয়ার ৪ দিন আগে কারও শরীরে এ রোগের সংক্রমণ ঘটে। কেউ অসুস্থ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা থেকে অন্যদের মধ্যে ছড়ায়। অর্থাৎ রোগীর হাম হয়েছে কিনা তা নিশ্চিত হওয়ার আগেই অন্যদের মধ্যে এ রোগ ছড়িয়ে পড়ে।

লক্ষণ

হাম সাধারণত সর্দির লক্ষণ দিয়ে শুরু হয়, যা দিনে দিনে নানা লক্ষণ প্রকাশ করতে থাকে। দিনকে দিন যে লক্ষণগুলো প্রকাশ পায় তা নিম্নে দেয়া হলো -

প্রথম দিন

- হামের শুরুতে ১০৪ ডিগ্রী ফারেনহাইট-এর উপরে জ্বর হয়
- গা ম্যাজ ম্যাজ করে
- নাক দিয়ে পানি পড়ে
- হাঁচি হয়
- চোখ লাল হয় এবং চোখ দিয়ে পানি পড়ে

দ্বিতীয় দিন

- কাশি শুরু হয়
- আলো সহ্য করতে পারে না
- মুখের ভিতরের আবরণীতে ছোট ছোট দানার মতো দাগ ওঠে, যাকে কপলিক্স স্পট (Koplik's Spot) বলে
- এ সময়ে গলার স্বর ভেঙ্গে যায়

তৃতীয় দিন

- মুখের ভিতরের এই দাগগুলো মিলিয়ে যায়

চতুর্থ দিন

- ঘামাচির মতো লাল লাল দানা দেখা দেয়, যা প্রথমে কানের পেছনে এবং কপাল ও চুলের সংযোগ স্থলে হয়। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে দানাগুলো শরীরের সমস্ত ত্বকে ছড়িয়ে পড়ে

ষষ্ঠ - সপ্তম দিন

- দানাগুলো বিবর্ণ হয়ে ক্রমশ বাদামি বর্ণ ধারণ করে এবং মিলিয়ে যেতে থাকে
- এ সময়ে জ্বরও চলে যায়
- শিশুরা খাবার খেতে চায় না
- শিশুরা নেতিয়ে পরে বা অবসন্ন হয়ে পরে

পরীক্ষা

- রক্তের অ্যান্টিবডি পরীক্ষাঃ IgM-অ্যান্টিবডির উপস্থিতি পাওয়া যায়
- মোলীকুলার পরীক্ষাঃ মিজেলস RNA ভাইরাস-এর উপস্থিতি পাওয়া যায়
- আইসোলেসন অব ভাইরাসঃ থুথু, চোখের পানি, নাকের পানি, প্রস্রাব ইত্যাদি পরীক্ষা করলে ভাইরাস এর উপস্থিতি পাওয়া যায়

চিকিৎসা

- প্রাথমিক চিকিৎসা
  - জ্বর থাকা পর্যন্ত বা গাঁয়ে ফুসকুড়ি ওঠা পর্যন্ত রোগীকে পূর্ণ বিশ্রামে থাকতে বলতে হবে
  - সুষম খাবার এবং প্রচুর পানি পান করতে বলতে হবে
  - রোগীকে অন্যান্য শিশুদের কাছ থেকে দূরে রাখতে বলতে হবে, যাতে অন্যদের সংক্রমিত করতে না পারে
- রোগীকে ভিটামিন-এ ক্যাপসুল দিতে হবে, এতে রোগীর বিশাদ গ্রস্ততা কমবে
- যদি জ্বর থাকে তাহলে ট্যাবলেট প্যারাসিটামল দিতে হবে
- শরীরের চুলকানি কমানোর জন্য ট্যাবলেট এন্টিহিস্টামিন দিতে হবে
- বিভিন্ন জটিলতার চিকিৎসা, যেমন - ব্যাকটেরিয়া দ্বারা সংক্রমণ, ডায়রিয়া ও নিউমোনিয়া হলে যথাযথ অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে

জটিলতা

হাম হলে প্রথমেই সতর্কতা অবলম্বন না করলে বিভিন্ন জটিলতা দেখা দিতে পারে, এমনকি শিশু মারাও যেতে পারে। হামের কারণে সাধারণত যে জটিলতাগুলো দেখা দেয় সেসব হলো -

- কানের প্রদাহ
- ডায়রিয়া
- চোখের কর্নিয়ার প্রদাহ, কর্নিয়াতে আলসার বা ঘা হওয়া
- শ্বাসনালীর প্রদাহ
- নিউমনিয়া
- মস্তিষ্কের প্রদাহ যেমন মেনিনজাইটিস
- যকৃতের প্রদাহ

প্রতিরোধ

হামের টিকা অত্যন্ত কার্যকরী। শিশুর ৯ মাস পূর্ণ হয়ে ১০ মাসে পড়লেই হামের টিকা দিয়ে দিতে হবে। একবার হামে ভুগলে বা হামের টিকা দিলে সাধারণত আর হাম হবার সম্ভাবনা থাকে না। হামের টিকা দেবার পরও কদাচিৎ নগণ্য মাত্রায় হাম হতে পারে। কোন শিশুর যদি হাম হয়ে থাকে এবং হামের টিকা দেওয়া না থাকে, তবে তাদেরকে ইঞ্জেকশন গামা গ্লোবিউলিন মাংসপেশীতে দিতে হবে।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

রক্তনালী ব্লক হওয়া প্রতিরোধ করবে ৭ টি খাবার

অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এবং অস্বাস্থ্যকর খাদ্যাভ্যাসের কারণে রক্তনালী ব্লক হওয়া খুবই স্বাভাবিক একটি ব্যাপার। শুধুমাত্র এই কারণে হৃদপিন্ডের নানা সমস্যায় ভুগতে দেখা যায় অনেককে। এমনকি হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন অনেক রোগীই। কিন্তু রক্তনালী ব্লক হওয়ার এই সমস্যা থেকে খুবই সহজে মুক্ত থাকা যায় চিরকাল। কয়েকটি সহজলভ্য খাবার রক্তনালীর ব্লক হওয়া প্রতিরোধ করবে।

তৈলাক্ত মাছ

তৈলাক্ত মাছ বিশেষ করে সামুদ্রিক তৈলাক্ত মাছের ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড দেহের ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা কমিয়ে হৃদপিন্ডকে চিরকাল সুস্থ ও নীরোগ রাখতে বিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে।

গ্রিন টি

গ্রিন টি অর্থাৎ সবুজ চায়ে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ক্যাটেচিন যা দেহে কোলেস্টেরল শোষণ কমায় এবং হৃদপিন্ডকে সুস্থ রাখতে বিশেষভাবে সহায়তা করে। প্রতিদিনের চা-কফির পরিবর্তে গ্রিন টি পান করলে দেহের সুস্থতা নিশ্চিত হয়।

দারুচিনি

দারুচিনির অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তসংবহনতন্ত্রের সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে থাকে। এছাড়াও গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১ চামচ দারুচিনি গুঁড়ো দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং রক্তনালীকে চর্বি জমে ব্লক হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করে।

ব্রুকলি

ব্রুকলিতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন-কে যা দেহের ক্যালসিয়ামকে হাড়ের উন্নতিতে কাজে লাগায় এবং ক্যালসিয়ামকে রক্তনালীর দেয়ালের ক্ষত করার হাত থেকে রক্ষা করে থাকে। ব্রুকলির ফাইবার উপাদান দেহের কোলেস্টেরল কমায় এবং উচ্চ রক্তচাপের ঝুঁকি কমিয়ে দেয়।

আপেল

আপেলে রয়েছে পেকটিন নামক কার্যকরী উপাদান যা দেহের খারাপ কোলেস্টেরল কমায়, যার ফলে রক্তনালীতে চর্বি জমার প্রক্রিয়াও কমে যায়। গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন মাত্র ১ টি আপেল রক্তনালীর শক্ত হওয়া এবং ব্লক হওয়ার ঝুঁকি প্রায় ৪০% পর্যন্ত কমিয়ে দেয়।

তিসীবীজ

তিসীবীজে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে আলফা লিনোলেনিক অ্যাসিড যা উচ্চ রক্তচাপ কমায় এবং রক্তনালীর প্রদাহকে দূর করতে সহায়তা করে এবং সেই সাথে রক্তনালীর সুস্থতা নিশ্চিত করে।

কমলার রস

গবেষণায় দেখা যায় প্রতিদিন ২ কাপ পরিমাণে শুধুমাত্র বিশুদ্ধ কমলার রস পান করলে রক্ত চাপ স্বাভাবিক থাকে এবং কমলার রসের অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রক্তনালীর সার্বিক উন্নতিতে কাজ করে, ফলে রক্তনালী নষ্ট হওয়ার হাত থেকে রক্ষা পায়।

তথ্যসূত্রঃ ইন্টারনেট

ইনফো কুইজ

ইনফো কুইজের সকল প্রশ্নগুলো বিশেষ প্রবন্ধ "উচ্চ রক্তচাপ" থেকে নেয়া হয়েছে। আশা করি আপনারা বিশেষ প্রবন্ধটি ভালোভাবে পড়ে সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিয়ে ইনফো মেডিকাসের সাথে সংযুক্ত বিজনেস রিপ্লাই পোষ্ট কার্ডটি আগামী ২৫ অক্টোবর ২০১৬ ইং তারিখের মধ্যে আমাদের বিক্রয় প্রতিনিধির নিকট হস্তান্তর করবেন।

১ **পৃথিবীতে ২৫ বছরের উর্ধ্বে জনসংখ্যার শতকরা কত ভাগ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত?**

ক) ২০ ভাগ
খ) ৩০ ভাগ
গ) ৪০ ভাগ
ঘ) ৫০ ভাগ

২ **স্বাভাবিক রক্তের চাপ কত?**

ক) ১৮০/১০০ মিলিমিটার অফ মারকারি
খ) ১২০/৮০ মিলিমিটার অফ মারকারি
গ) ১১০/৫০ মিলিমিটার অফ মারকারি
ঘ) ১৫০/৯০ মিলিমিটার অফ মারকারি

৩ **উচ্চ রক্তচাপের লক্ষণ নয় কোনটি?**

ক) মাথা ব্যথা হওয়া
খ) ঘাড়ে ব্যথা হওয়া
গ) পেটে ব্যথা হওয়া
ঘ) বুক ধড়ফড় করা

৪ **গ্রেড-৩ উচ্চ রক্তচাপে সিস্টোলিক রক্তচাপ কত থাকে?**

ক) ১৮০ মিলিমিটার অফ মারকারি বা বেশি
খ) ১৪০ মিলিমিটার অফ মারকারি
গ) ১৭০ মিলিমিটার অফ মারকারি
ঘ) ১৬০ মিলিমিটার অফ মারকারি

৫ **নিচের কোনটি উচ্চ রক্তচাপের পরীক্ষা?**

ক) মস্তিস্কের সিটিস্ক্যান
খ) পেটের আল্ট্রাসনোগ্রাফি
গ) ১২-লীড ই সি জি
ঘ) পায়ের এম আর আই

৬ **বিশ্বে প্রতি বছর কত মিলিয়ন মানুষ উচ্চ রক্তচাপের জটিলতায় মৃত্যু বরণ করে?**

ক) ১৭.৩ মিলিয়ন
খ) ১৫.৫ মিলিয়ন
গ) ১২.৭ মিলিয়ন
ঘ) ১৯.২ মিলিয়ন

৭ **উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণের ওষুধ কোনটি?**

ক) প্যারাসিটামল
খ) এ সি ই ইনহিবিটর
গ) অ্যান্টিবায়োটিক
ঘ) এন্টাসিড

৮ **সেকেন্ডারি উচ্চ রক্তচাপের কারণ নয় কোনটি?**

ক) ধূমপান করা
খ) অতিরিক্ত লবণ খাওয়া
গ) পরিবারে কারো উচ্চ রক্তচাপ থাকা
ঘ) শাকসবজি খাওয়া

৯ **উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে দৈনন্দিন কোন কাজটি করা উচিত?**

ক) চর্বিযুক্ত খাবার খাওয়া
খ) ধূমপান করা
গ) নিয়মিত শারীরিক পরিশ্রম করা
ঘ) অতিরিক্ত লবণ খাওয়া

১০ **উচ্চ রক্তচাপের জটিলতা নয় কোনটি?**

ক) স্ট্রোক
খ) হার্ট ফেইলর
গ) ফুসফুসে ক্যান্সার
ঘ) হাইপারটেনসিভ রেটিনোপ্যাথি

প্রকাশনায়
মেডিকেল সার্ভিসেস্ ডিপার্টমেন্ট, এসিআই লিমিটেড
নভো টাওয়ার, ১০ম তলা, ২৭০ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-১২০৮

ডিজাইন
ক্রিয়েটিভ কমিউনিকেশন লিঃ, রোড # ১২৩, বাড়ী # ১৮এ
গুলশান ১, ঢাকা ১২১২

ADVANCING POSSIBILITIES